অদ্ভুত আঁধার এক

মাসকাওয়াথ আহসান

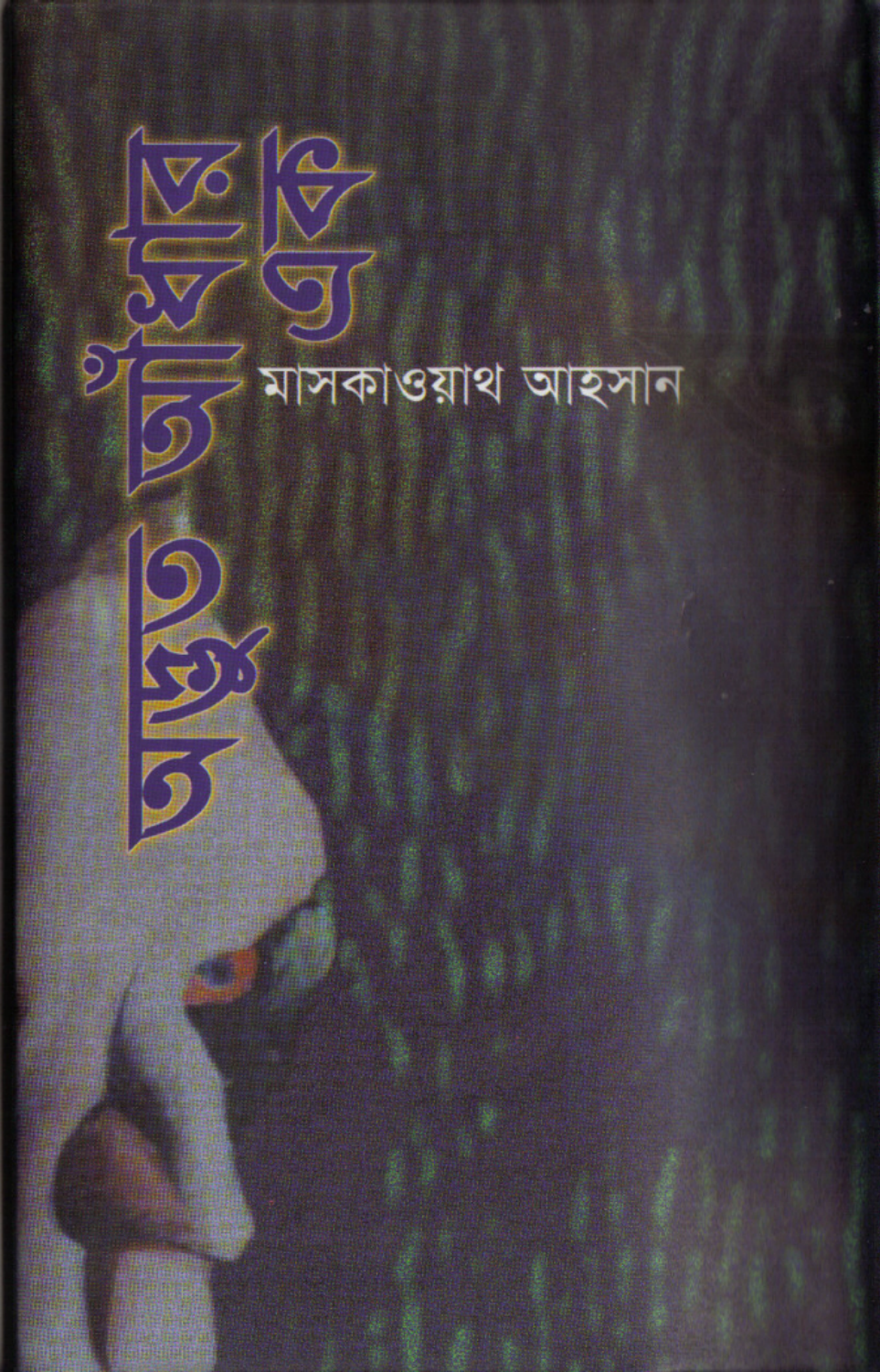

অদ্ভুত আঁধার এক ● মাসকাওয়াথ আহসান

অদ্ভুত আঁধার এক

মাসকাওয়াথ আহসান

অদ্ভুত আঁধার এক

সূফী আউলিয়ার হাত ধরে এক নরমপন্থার ইসলাম একসময় মিশেছিল সবুজ বদ্বীপের পললে। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ তাই ঐতিহ্য সঞ্জাত এক আত্মপরিচয়।

হঠাৎ এক কট্টর পন্থার উত্থান বাংলাদেশকে ইসলামী মৌলবাদের উত্তপ্ত শয্যায় পরিণত করলেও উদারপন্থী জনমানুষ ঐ উগ্রতাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

একবিংশের বিষণ্ন সময়গুলোতে খুব অবাক হয়ে প্রত্যক্ষ করি দেশে দেশে মৌলবাদের উত্থান। হিন্দুত্ববাদী কট্টর চিন্তার ঢেউ যেমন ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপেও। জায়গায় জায়গায় চাঁদা উঠছে ভারতের হিন্দু মৌলবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতায়। আরো অবাক লাগে রেনেসাঁর অভিঘাতে যে পশ্চিমা বিশ্ব ধর্মকে রাষ্ট্রচিন্তা থেকে বিযুক্ত করেছিল, সেখানেও এখন খ্রিস্টীয় ভোট ব্যাংককে মাথায় রেখে একধরনের প্রতিক্রিয়াশীলতাকে উস্কে দেওয়া হচ্ছে। তার মানে কী এই ইতিহাস এখন পেছনের দিকে হাঁটছে। হঠাৎ অন্ধকার এক সময়- যেখানে রাজনীতিতে কট্টর ধর্ম ভাবনাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে অমোঘ নির্ধারক। এই সব সমসাময়িক ভাবনার সাহজিক উচ্চারণের চেষ্টা থেকেই এ উপন্যাস লেখা। আমি বুঝে গেছি, আমি শরৎচন্দ্রের ছাত্র। পোস্ট মডার্নিজম, ম্যাজিক রিয়ালিটি কিংবা ওরিয়েন্টালিজম আমার কাছে দুর্বোধ্য শব্দবন্ধ। কাজেই এ উপন্যাস বোদ্ধা পাঠকদের জন্য নয়। আমার মতো সাধারণ পাঠকদের জন্যই লেখা হলো অদ্ভুত আঁধার এক।

মাসকাওয়াথ আহসান
ডিসেম্বর ২০০৫ বন, জার্মানী

রাত যতই বাড়ে আড্ডাটা ততই জমে ওঠে।

আড্ডার ধরনটাই এমন। তবে এই আড্ডাটা খানিকটা ডি-ক্লাসড। সুশীল সমাজের আলোকিত আড্ডা নয়। ফ্রাঙ্কফূর্ট স্কুল কিংবা সাব অল্টার্ন থট নিয়ে কচকচানি নেই। নেহাত ঘামে ভেজা স্যাঁতসেতে গন্ধের আড্ডা। প্রথম প্রথম গালভাঙা রিক্সাঅলা কিংবা পাংশুটে রেল শ্রমিক একটু কুঁকড়ে বসে থাকতো। ভাবতো কলেজের প্রিন্সিপালের সাথে বসে কি আর গপসপ হয়। তার সামনে ছাত্রের মতো জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকা আর কী।

স্টলের মালিক দাঁত কেলিয়ে বলতো

- সার আপনি বসলি পারে বাকী খদ্দের ভাগি যায় আপনের সামনে বসতি শরম করে।

- কেন শরম কিসের আমি কী মন্ত্রী না এমপি কলেজে পড়াই। মাস গেলে যে পয়সা পাই তা দিয়ে সাহেবদের তিন ঠেঙে কুকুরের কেবল এক ঠ্যাঙের পরিচর্যা চলে।

এমন কঠিন কথা বুঝতে কফিল মিয়ার কষ্ট হয়। কিন্তু প্রিন্সিপাল সাহেব এরকম করেই কথা বলেন। তাকে প্রশ্ন করা মানে জটিল উত্তরের ধন্দে পড়ে যাওয়া।

-সার আপনি ভদ্দরলোক মানুষ

অন্য সারেরে লিয়ে আড্ডা দিলিই পারেন।

শুনিছি রেলের অপিসার কেলাবে শিশি টিশিও চলে।

সে এক আছে অবশ্যই। রেলের দোতলা ক্লাব। বৃটিশ আমলের দরাজ দোতলা বাড়ি। মোটা মোটা খিলান। ছাদে বিশাল আয়তন বর্গা। রেল লাইন কেটে বানানো। ইংরেজ সাহেবেরা সেখানে বিলিয়ার্ড খেলতেন। পুরনো মডেলের গাড়ি নিয়ে কেউবা রেলের স্যালুনে হাজির হতেন সন্ধ্যের মজমা বসাতে।

এখনো সেখানে বাঙ্গু সাহেবেরা আসেন। বাঙ্গু সাহেব মানে সেই সব সাহেব যারা বৃটিশ শাসন, পাকিস্তানি শাসনের হ্যাঙওভার। হুইস্কির তলানি কিংবা উপজাত হয়ে এখনো সেখানে আসেন, ফার্স্ট ক্লাস ঠিকাদারদের সাপ্লাই দেয়া বেনসন পোড়ান, একবোতল স্কচ

নিয়ে চোদ্দ পনের জন ফ্রি লোডার রুলস অব বিজিনেসে বর্ণিত হাইয়ারার্কি অনুসারে হাফ পেগ থেকে চার পেগ অব্দি পান। বার টেন্ডার অমিয়ভূষণ সেই পৌরাণিক আমল থেকে রেল ক্লাবের সাকী হয়ে আছে। তার শুদ্ধ উচ্চারণের ইংরেজি শুনে নবাগত বিসিএস সাহেবেরা অমিয়ভূষণের ভ্রু উপড়ে দিতে উদ্যত হয়। কিন্তু সেটা সম্ভব হয় না ঐতিহ্যের কথা ভেবে। কারণ অমিয়ভূষণ কেবল রেল ক্লাবের সূরা বালক নয়- ইতিহাসের ধারা ভাষ্যকার। সে ইতিহাস বড় সাহেবদের ধমক ধামকে খানিকটা বিকৃত হয় না তা নয়, কারণ কাকে বড় করে কাকে ছোটো দেখাবে সে। তবে রাত যত গড়ায় স্যারদের মদের তলানি খেয়ে অমিয়ভূষণ ঋজু হয়ে ওঠে। এই তো সেদিন বেফাঁস এক গপপো শুনিয়ে দিলো বিসিএস বড় কত্তাকে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কফিলুদ্দী ওরফে কে ইউডিন পরহেজগার মানুষ। তিনি বেশরিয়তী কায়কারবার বিলকুল পছন্দ করেন না। জায়নামাজে অবিরাম সেজদা করায় কপালে নূরের আলো ঠিকরে যাকে বলে ঘাঁটি পড়ে গেছে। দাড়িতে মেহদী চর্চার আঁচড়। তিনি রেল ক্লাবের বেলেল্লাপনা সহি বলে জ্ঞান করেন না। তার মতে এইসব বেদাতী কাজের দাঁতভাঙা জবাব এইসব কাফেরেরা পরকালে লাভ করবে। ইহারা জানে না ইহাদেরও পুল সিরাত পার হইতে হইবে। তবে রেল ক্লাবে এসে হিন্দুর হাতে এক পেয়ালা চা খাওয়ার বদ অভ্যাস তিনি পরিত্যাগ করতে পারেন না।

এক সন্ধ্যেয় অমিয়ভূষণের চা ভারী বিচ্ছিরি ঠেকে।

কি ব্যাপার অমিও চায়ে কিবা দিছাও।

চা নাকি মেন্দী পাতা। সুয়াদ নাই।

ভেরী বেড। ভেরী বেড।

অমিয় ভূষণ 'ভি' এর অশুদ্ধ ঠোট জাপটানো ভাটিয়ালী উচ্চারণে ক্ষিপ্ত হয়। আর ব্যাড শব্দটিকে বিছানার অনুরূপ উচ্চারণ করায় রেল ক্লাবের ঐতিহ্যের ইজ্জতে বড়ই লাগে। তবে অমিয়ভূষণের সাহস কী তা ঠিক করে দেয়। প্রিন্সিপাল স্যার থাকলে তাকে দিয়ে এই বদ কাজটা করানো যেত।

যাই হোক অমিয়ভূষণ অন্য এক পন্থা হাজির করে জেলা ম্যজিস্ট্রেটকে টাইট দেবার।

যদি বেআদবি না ন্যান তো

একখান গপপো বলি হুজুর। হুজুর শব্দে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আপত্তি নেই। কারণ শরীয়াহ আইন প্রযুক্ত হলে প্রশাসনে হুজুর শব্দটি যুক্ত হবে নিশ্চিত।

- কি কবা কও। তুমি তো বেআদ্দবের আঁটি। অমিয়ভূষণ জিভ কাটে। গত পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে বড় সাহেবদের সামনে জিভ কাটতে কাটতে সামনে থেকে খানিকটা খসে যাবার উপক্রম হয়েছে।

হুজুর ধরেন একটা টি ব্যাগ নেলাম। টি-ব্যাগ প্রথমবারে চিপে যাদের খাওয়াতেম তারা হলেন গিয়ে সিএসপি। একই টি-ব্যাগ দ্বিতীয়বার চিপে যাদের খাওয়াতেম তারা হলেন গিয়ে ইপিসিএস। আর সেই টি-ব্যাগ তৃতীয়বার চিপে যাদের খাওয়াই তারা হলেন গিয়ে বিসিএস।

এই গল্পটা বলে অমিয়ভূষণ কালীমূর্তির মতো জিভ কেটে দাঁড়িয়ে থাকে যেন তার পায়ের নিচে স্ব-স্বামী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। কে ইউডিন গলা খাঁকারী দিয়ে পান খাওয়া দাঁত বের করে হাসে।

-সুন্দর বলিচো অমিও, তাজ্জব একজামপল দিলা! এই স্টোরিতো কেবিনেট সেক্রেটারি সমীপে প্রেরণ করা দরকার। যাই হোক আক্কাসরে ওজুর পানি দিতে বলো। তুমি তো হিন্দু তোমার হাতে চা চলে ঐডা চলে না।

প্রিন্সিপাল হিসেবে জয়েন করার পরপর সাজিদ ওর ডাক্তার বন্ধুর চাপাচাপিতে কয়েকদিন গেছে রেল ক্লাবে। কিন্তু স্যুডো এলিটদের হরলাল রায় সঙ্গীত ব্যাকরণ বোধ, পত্রিকার উপসম্পাদকীয় সঙ্গীত ইন্টেলেকচুয়াল হেজিমনি আর মদিরা সঙ্গীত আদি রসাত্মক আড্ডায় বসে ম্যাজিস্ট্রেট সুরাইয়া হাসিনের দেহ বল্লরীর মাপজোঁক শুনতে কাঁহাতক ভালো লাগে। মফস্বলের সুশীল সমাজের অতৃপ্ত শারীরবৃত্তীয় বাসনার নিউক্লিয়াস সুরাইয়া হাসিন। তিনি কখনো পথ ভুল করে রেল ক্লাবে এসে পড়লে পাণি প্রার্থীরা শশব্যস্ত হয়ে পড়ে।

প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদাররা ম্যাডামের খেদমতে দিশেহারা হয়ে কেউবা ফানটা কেউবা কোকাকোলা নিয়ে হাজির হয়।

সুরাইয়া তার বাদামী রঙের মুখাবয়বে শমী কায়সারের লাস্য নিয়ে এসে শম্পা রেজার মত চোখ নাচিয়ে বলে

দেখছেন না মোটা হয়ে যাচ্ছি।

শুধু পানি, মিনারেল ওয়াটার।

'মোটা হয়ে যাচ্ছি' এই একটি বাক্যকে অনুসরণ করে কমপক্ষে বাইশ জোড়া চোখ। তারপর চোখগুলো হন্তদন্ত হয়ে মেদ পর্যবেক্ষণ করে। সুরাইয়া হাসিনের টাইট কামিজ ফুঁড়ে মেদের টায়ারগুলো উঁকিঝুঁকি দেয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নাউজুবিল্লাহ বলে নামাজের ঘরে গিয়ে কেবলামুখী হয়।

কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক সুরাইয়াকে তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা থেকে গলা কাঁপিয়ে দুটো লাইন শুনিয়ে দেয়। কোণার সোফায় সাজিদ একা বসে থাকে। ছত্রিশ বছর বয়স এই সস্তা যাত্রা দেখার জন্য অনুকূল সময় নয়। তার চেয়ে লালন সেতুর পাশে টি স্টল, সেইখানে তিন ঠেঙে টুল-

ধূসর বালিয়াড়ি থেকে ধেয়ে আসা ফাগুন হাওয়া। জ্যোৎস্নায় একাকী কৃষ্ণচূড়া গাছ। চায়ের চুলায় হিসহিস আগুন। ভাঙা টেপরেকর্ডারে মান্নাদের গান।

ও ক্যানো অত সুন্দরী হলো

অমনি করে ফিরে তাকালো-

না এই গান সুরাইয়া হাসিনের জন্য রচিত হয়নি। তবে এই গানটা সাজিদের ভালো লাগে।

ক্লাসিক্যাল শোনা বন্ধুরা ধিক্কার দিলেও সাজিদ বড় গলা করে বলবে এই গানটাই সন্ধ্যায় একবার শোনা চাই-ই চাই। তবে চাখানার ক্যাসেট প্লেয়ার পুরনো হয়ে যাওয়ায় একটা কর কর ক্যাটর ক্যাটর শব্দ বাড়তি যন্ত্রানুষঙ্গ হয়ে বাজে।

অন্তত: রেলক্লাবে বাধ্যতামূলক বিটিভির নিউজ দেখার চেয়ে ভালো।

বেরিয়ে যাবার পথে সুরাইয়া হাসিন নিজেই এগিয়ে এসে বলে

-আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি না।

আপনার বন্ধু রিয়া আমার বেস্ট ফ্রেন্ড।

ও আচ্ছা তাই নাকি বলে বেরিয়ে যায় সাজিদ। পিছে ডাক্তার বন্ধুও বেরিয়ে আসে।

-তুই এত মুডী ক্যান।

মানুষের সাথে একটু কথা বললে কী হয়।

-দ্যাখ রনি মানুষের সাথে যেন বেশি

কথা বলতে না হয় সেই জন্যই তো

পাকশীতে আসা। কি বলিস!

রনি গাড়িতে করে বাসায় নামিয়ে দেয়। রনির এই গাড়িটা রিক্সা চড়ার রোমান্টিসিজমের জন্য কাল হয়েছে।

....

আহারে রিক্সা। রিক্সার হুড ফেলে দিয়ে বেনসনে একটা সুখটান দেবার মজা কতদিন পায় না সাজিদ। কিন্তু ডাক্তার সাহেবের রেড ক্রিসেন্ট আঁকা গাড়িটা সারাক্ষণ ছায়ার মত অনুসরণ করে সাজিদকে। বউকে গাড়ি পাঠাতে মনে থাকে না ডাক্তার সাহেবের। কিন্তু বন্ধুর জন্য গাড়ির ডিগ্গি ভরে বাজার করে পাঠাতে তিনি ভোলেন না কখনোই।

-গিভ মি আ ব্রেক।

খবরদার গাড়ি পাঠাবি না। আমি রিক্সায় চড়তে চাই।

-হাইওয়েতে রিক্সায় চড়বা মিঞা।

ট্রাক এসে পোঙ্গার মধ্যে মারলে

সত্যজিৎ রায়ের শেষ অপু নিপাত যাবে।

পাকশীতে এসে কলেজে জয়েন করার পর থেকে বন্ধুরা 'অপু' বলে ঠাট্টা মস্করা করছে।

কবি রেজা, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর মতো প্রাজ্ঞ হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করলো; এতো জায়গা থাকতে পাকশী কেন!

-কারণ পাকশীতে রেলগাড়ির ঝমঝম

শব্দ শোনা যায়। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ভেঙে

গম গম শব্দ করে মাঝরাতে যখন

ট্রেন যায় মনে হয় বেঁচে আছি।

এই তো আমার বুকের মধ্যে বেঁচে

থাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

- মরণ আমার পুরান পাগল ভাত পায় না

নতুন পাগলের আমদানি।

ভালো অফার আছে পত্রিকায় জয়েন কর।

পত্রিকায় জয়েন করাই যেতো। ইউরোপে পাঁচ দশ বছর কাটিয়ে ঢাকায় এসে কতজনই তো স্মার্ট সম্পাদক হয়ে গেছে। কিন্তু সেই স্মার্টনেস তো সাজিদের নেই। পত্রিকায় ঘটা করে ভ্যালেনটাইন দিবস সংখ্যা করে ঢাকার তরুণ তরুণীদের মাথায় ভ্যালেনটাইনের ভূত ঢুকিয়ে দেয়া সম্ভব ছিল। অচিরেই তারেক রহমানের সাথে যোগাযোগ করে বিএনপির থিংকট্যাংক হওয়া যেতো বৈকি। টিভিতে টকাস টকাস শব্দ করে টকশো করা যেতো। সাজিদের মাথায় চুল যা আছে তাতে পেছন থেকে সামনে এনে এলিয়ে রাখা দরকার হতো না। খানিকটা ঝুলফি ছেড়ে দিলে ট্রেন্ডি হওয়া যেতো। সাজিদ প্রধানমন্ত্রীর জন্য এমন ভাষণ লিখে দিতো, যে মনে হতো পাঁচ বছর ভুল করে নির্বাচনের সামনে এসে ক্ষমা চাইলেই সব গুণাহ মাফ হয়ে যায়। পরওয়ারদিগার মাফ না করলেও জনগণ বিশ্বাস প্রবণ, সাজিদের লিখে দেওয়া ভাষণে বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চয়ই থাকতো।

এনজিও পটু শিবলী ভাই পাকশীতে আসার সিদ্ধান্ত শুনে বলেছিল

-গড মাস্ট বি ক্রেজী।

কাম অন আমার সাথে এনজিও করো।

এনজিও সেক্টরে তোমার মতো ছেলে কোথায়!

হ্যাঁ এনজিও তো করাই যেতো। পূর্ব ইউরোপের সাবেক সোভিয়েত দেশে পাঁচ দশ বছর কাটিয়ে এসে কতজনই তো এনজিওর কুমীর হয়েছে। সাথে আসমানী শব্দ সহযোগে কবিতা লেখা যেতো। পয়লা বৈশাখে কুষ্টিয়া থেকে বাউল এনে এনজিওর ছাদে বাউল গানের আসর বসানো যেতো। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কানকুন সম্মেলনে যাওয়া যেতো। বিশ্ব সামাজিক ফোরামে চুলে জেল দিয়ে উল্টো করে আঁচড়ে বক্তৃতা দেয়া যেতো- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার গুষ্টি উদ্ধার করা যেতো। পত্রিকার কলামে জঙ্গিবাদের পক্ষে সাফাই গাওয়া যেতো। জঙ্গিবাদকে সর্বহারা আন্দোলনের সমান্তরাল প্রতিপাদ্য হিসেবে তুলে ধরা যেতো। গরু লাদে কিন্তু ট্রাক্টর লাদে না বা হাগে না এই যুক্তিতে ট্রাক্টর বিরোধী আন্দোলন করে গরু কিংবা স্বজাতির সমব্যথী হওয়া যেতো। সাজিদ এসব কতকিছুই তো করতে পারতো। কিন্তু সাজিদ তো ব্যর্থ বাম নয়। একদা চীন পন্থীদের মত করে ডিগবাজী দেবার প্রয়োজন কোথায়। সুশীল সমাজের একজন হয়ে বিবৃতি দেবার রিরংসা তাকে কখনোই তাড়া করে না।

আরো বেশ কিছু দিন সাজিদকে বন্ধুদের সামনে নিজের অবস্থানকে জাস্টিফাই করতে হবে। কারণ সমাজের কাজই হচ্ছে হাতে একখানা শোকজ লেটার ধরিয়ে দেয়া।

প্রিন্সিপালের কোয়ার্টারটা নেহাত মন্দ নয়। লাল ইটের দোতলা বাড়ি। সামনে নারকেল গাছ। দরাজ বারান্দায় পাতা বাহারের ঝাড়। টবগুলোতে শরিফ মিয়া ক্যাটকেটে লাল রঙ দিয়ে রেখেছে। কে বোঝাবে শরিফ মিয়াকে পোড়া মাটির আগুন রঙা টবের মধ্যে মোজাইক পাতাবাহার অপূর্ব লাগে। ঢাউস বাড়িটাতে একা থাকতে মন্দ লাগে না। একাকীত্বের অন্যরকম একটা আনন্দ আছে। এটা শোকজ লেটারের উত্তরের প্রথম লাইন। শরিফ মিয়া ভগ্নদূতের মত দৌড়ে আসে।

মোবাইল ফেলি রাখি গিছেন ক্যা।

তিনবার ফোন আসিছে। দুইবার

ল্যান্ড লাইনে। জার্মানী থাকি।

আবার করবি। রাত ১২ ডায়।

তাইতো মোবাইলটা ফেলে গেছে সাজিদ। সারাক্ষণ ঐ স্টুপিড সিমফোনী ভালো লাগে না। বন্ধুরা অনেক বেশি কনসার্নড। সবাই ভাবছে সাজিদ একটা পাগলামি করছে। খুব দ্রুত মোবাইলের মাধ্যমে জ্বীন ভূত ঝাড়তে চাচ্ছে সবাই। শুধু একজন মানুষ কেবল একটা প্রশ্ন করেই থেমে গেছেন। তিনি হচ্ছেন সাজিদের বাবা। ইউরোপ থেকে ফিরে পাকশীতে ঘাঁটি গাড়ার পাগলামি নিয়ে একটাই প্রশ্ন ছিল তার-

-এটাও কি তোমার একটা হুইম!

-সারাজীবন ফার্স্ট বেঞ্চে বসার র‍্যাট রেসে

আমি টায়ার্ড। এবার ব্যাকবেঞ্চি হতে চাই।

আর কোনো প্রশ্ন নয়। সাদা গোঁফের ফাঁকে মসৃণ হাসি গলিয়ে বললেন-

আগেই বলেছিলাম ছাত্র পড়ানোর মতো

আনন্দ আর কিছুতেই নেই।

এত দেরীতে বুঝলে!

সারাজীবন বাবার আস্কারা পেয়ে সাজিদ উদ্ধত হতে শিখেছে। কলেজের বাংলার অধ্যাপক ছোট বেলায় সাজিদকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন,

-শিক্ষকের ছেলে এত দুর্বিনীত কেন!

-শিক্ষক বাবার আস্কারায়।

অধ্যাপক দুষ্টু হাসি হেসে বলেছিলেন

-আজকাল আমারো তোমাকে খানিকটা

প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছে করে।

ঠিক রাত বারোটার সময় ফোনটা বেজে ওঠে।
-হ্যালো
-তুমিই তো একসময় জ্ঞান দিতে যে মোবাইল
রাখার অর্থ হচ্ছে একধরনের দায়বদ্ধতা।
তুমি কাউকে মোবাইল নম্বর দেবার অর্থ
তুমি ২৪ ঘণ্টা অ্যাভেলএবল।
-সরি একদম মনে ছিল না।
- মনে ছিল না মানে আবার কী।
তুমিই না আমাকে বলতে মোবাইল
জিনিসটা মেয়েদের জন্য নয়।
প্রথম সমস্যা হচ্ছে ফোন বাজছে
ঢাকায়-রত্না আপা হয়তো তখন
ঘোড়াশালে ফিল্ড ভিজিটে।
অথবা ব্যাগের এমন গহীনে মোবাইল
সেট ১২ বার রিঙ্গার বাজলেও
তার মধ্যে খুঁজে পান না রত্না আপা।

-এক্সাক্টলি মোবাইল ফোন ইস্যুতে
সব মেয়েই রত্না আপা।
- তাহলে তোমাকেও কী রত্না
আপা বলে ডাকবো।
-বললাম তো সরি।
আর এরকম হবে না।
-তারপর, তুমি কী পুরোপুরি
সেটলড।
- কখনোই কী আমি পুরোপুরি
সেটলড ছিলাম।
- দ্যাখো ঐ সক্রেটিক প্যারাডক্সে
কথা বলো না। বি স্পেসিফিক।

-হ্যাঁ আমি পুরোপুরি থিতু।
- কোনোভাবেই মত বদলাবে না।
- এখানে মত বদলানোর কী আছে!
-প্রতিদিন রয়টারে দেখছি
বোমা বাজির খবর। একটা না
একটা লেগেই আছে। আর তুমি
বলছো মত বদলানোর কী আছে!
-হ্যাঁ আফগানিস্তানেও একসময় তাই
হতো, তাই বলে সব মানুষ কী
দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।
-তার মানে তুমি স্বীকার করছো
সিচুয়েশন খারাপ।
-আমিতো ক্ষমতাসীন দলের মুখপাত্র
নই। আমিতো কোনোদিন বলিনি
সিচুয়েশন ভালো। জঙ্গি তৎপরতার
খবর মিডিয়ার সৃষ্টি।
- যেখানে দেখছো যখন তখন
বোমা ফুটছে, কারো নিরাপত্তা
নেই, সেখানে তুমি এরকম
নির্বিকার বসে থাকবে।
-লুক আমার কোনো ক্ষমতা নেই
জঙ্গিবাদ মোকাবিলার। আমি
ক্ষমতাহীন পেরিফেরির মানুষ।
বাট আই ক্যান ফেইস ইট।
-প্লিজ গ্রো আপ।
ডোন্ট ইউ টক লাইক এ টিনেজ।
-প্রসঙ্গটা বদলাও।
এই এক ধ্যানতারা ভালো লাগে না।
-প্লিজ কাম ব্যাক।

সাজিদ ধপ করে ফোনটা রেখে দেয়। তারপর অনেকবার রিং বাজে কিন্তু ধরে না। নাজিয়ার সঙ্গে কথা বললে ও যেন কনফিডেন্স হারাতে থাকে। ওর মনে হয় ধুত্তোর ফিরেই যাই।

এমন বন্ধু আর কে আছে তোমার মত সিস্টার। নাজিয়ার মত কি বন্ধু হয়। একটা মেয়ে এতটা কেয়ারিং, এতটা কনফিডেন্ট ভাবা যায় না। নাজিয়াকে দেখার আগে পর্যন্ত সাজিদের ধারণা ছিল মেয়ে মানেই হয় মুখরা আর নয়তো লবঙ্গ লতিকা।

অথচ নাজিয়ার সঙ্গে আড্ডা দেবার সময় একবারো মনে হতো না একটা মেয়ের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। মাথাটা এত পরিষ্কার।

শরিফ মিয়া টেবিলে খাবার সাজিয়েছে।

-সার খাওয়ার তো জমি বরফ

খাই লেন।

ঠাণ্ডা ভাত, ঠাণ্ড ভাজি, ঠাণ্ডা ডাল আর সদ্য গরম করে আনা গোরুর গোশ। এই কম্বিনেশানটা মারাত্মক।

শরিফ মিয়া যদি ইংরেজিটা বুঝতো তাহলে নাজিয়ার গোরুর গোশের রেসিপিটা শুনে নিতে পারতো। এমনি ভালোই রান্না করে শরিফ। কিন্তু ঝাল গোশের সেই শৌর্যটা অনুপস্থিত। ওহ নাজিয়ার রান্না করা ঝাল গোশ খেতে নাকে মুখে পানি পড়তো। মনে হতো রোলার কোস্টারে চড়েছে। সে ছিল এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি। এরপর সাজিদ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে আর অতীতচারিতা নয়। মাস্ট ফরগেট ইওর পাস্ট। কনসেনট্রেট অন দ্য প্রেজেন্ট।

আবার বাবার কথা মনে পড়ে। কোনো পেপারে নম্বর খারাপ আসলে সাজিদ ভেঙে পড়তো। বাবা ভীষণ থিওরিটিক্যাল। বাস্তবের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। একটা মানুষ কোন দুনিয়ায় যে বাস করেন।

-তুই নিজে কি রে।

ভেতর থেকে কে যেন টিপ্পনী দিয়ে ওঠে। আজকাল সাজিদের সঙ্গে একজন প্রতিসাজিদ যেন সারাক্ষণ ঘুরছে। সারাক্ষণ জ্বালাচ্ছে। খুনসুটি করছে।

কম্বল মুড়ি দিয়ে কান চেপে ধরে। আবার অতীত ভাবনা। সকালের জন্য একটা প্রতিজ্ঞা জপ করে।

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি আজ যেন সারাদিন বর্তমান লইয়া চলি।

একটা ব্যাপারে সাজিদের সঙ্গে ঈশ্বরদী রেলস্টেশনের পেশাদারী ফকিরদের ভীষণ মিল। ভীষণ শব্দটা কী ঠিক হলো! না এখানে ভীষণই হবে কারণ ঈশ্বরদী রেলস্টেশনের প্লাটফর্মে কিংবা ওভার ব্রিজে ডেল কার্নেগীর দুঃশ্চিন্তাহীন নতুন জীবনের ছাত্ররা যেভাবে নিঃশ্চিন্তে ঘুমায়, পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় যেকোনো টেম্পারেচারে, যেকোনো অবকাঠামোতে সে বিছানা হোক, প্লেন হোক, ট্রেন হোক, বসে হোক, দাঁড়িয়ে হোক, উবু হয়ে হোক, হাঁটু ভাঁজ

করে হোক সাজিদ সেটা পারে।

শুধু ডেল কার্নেগীর ছাত্রদের পাছায় রেল পুলিশের লাঠির বাড়ি পড়ে। সাজিদের পাছায় বাড়ি দেবার কেউ নেই। ছোট বেলায় মা সকালবেলায় ডাকতে গেলে বাবা বলতেন

-ওভাবে কর্কশস্বরে ডেকো না

ব্রেনে আঘাত লাগবে।

এতে ছেলের প্রতি স্নেহ প্রকাশের পাশাপাশি মার স্বর যে কখনো কখনো কর্কশ সেটা মনে করিয়ে দেয়া।

- কী বললে আমার স্বর কর্কশ তাহলে সুচিত্রা সেন জোগাড় করলেই পারতে। ঘাড় কাত করে সুরেলা কণ্ঠে গান গাইতো।

-হ্যাঁ ক্লাসমেট একজন ছিল

মালবিকা, খুব মিহি স্বরে

কথা বলতো।

-কলকাতার মেয়েদের ন্যাকামীর

কথা আমাকে বোলো না।

ব্যাস শুরু হয়ে যেতো, কমপক্ষে একঘন্টা। এর মধ্যে বাবা হাফডজন সিগ্রেট ফুঁকে ফেলতেন। আর মধ্যস্বত্বভোগী সাজিদ কানে তুলো দিয়ে আরো একঘন্টা ঘুমিয়ে নিতো।

- কী মিয়া সাজিদ এইবারতো

ইমেডিয়েট অতীত থিকা

ডিসট্যান্ট অতীতে চইলা গ্যালা মিয়া।

এই বার প্রতিসাজিদের টিপ্পনীতে কাজ হয়। মনে মনে বার বার ইয়া আজিজু ইয়া আজিজু বলতে বলতে ঘুমিয়ে যায় সাজিদ।

ঘুমটা আসলে সকালের দিকেই জমে আসে। সাজিদ তার নিজের এই সকালের ঘুমটিকে বেশ্যার কালঘুমের সাথে তুলনা করে থাকে। কারণ ঐ ঘুমটুকু নিষ্পাপ এক ঘুম। একজন শিশুর ঘুমিয়ে থাকার সাথে বেশ্যার শেষরাতের ঘুমটুকুর অনেক মিল।

শরিফ মিয়া সেই প্রেশাস হেভেনলী ঘুমটুকুকে রেলপুলিশের নিষ্ঠুরতায় এলোমেলো করে দেয়। পাছায় লাঠি মারার সাহস তার নেই। কিন্তু শরিফের কণ্ঠস্বর লাঠির অধিক।

সার উঠি যান

হোস্টেলে গন্ডগোল লাগিছে।

ছাত্রদলের ছেলিরা ছাএলীগের

ছেলিদের ভাগায় দিছে।

ধড়মড় করে ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে একটা ট্রাউজার আর টি শার্ট জড়িয়ে নিচে নামে। প্রিন্সিপ্যালের পোশাক এটা নয় দেখে ছাত্রদলের ক্যাডার মনে হচ্ছে। ভাইস প্রিন্সিপ্যালের পোশাক পরিহিত ফাররুখ সুহরোয়ার্দি লিভিং রুমের সোফায় বসে। সঙ্গে ছাত্রলীগের ইসমাইল। কলেজের ভিপি। ভাইস প্রিন্সিপ্যালের সফেদ পাজামা পাঞ্জাবী। নূরানী চেহারা। সৈয়দ বংশীয় ঘরাণার অভিজাত বুদ্ধিজীবী মার্কা। ইসমাইলের চেহারা ইসমাইলের চেহারা যেমন হওয়া উচিৎ তেমনই।

ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে গল্পের সুবিধার্থে ফাসু বলেই ডাকা হোক কী বলেন।

ইসমাইলের রক্তাক্ত চোখ। বন্ধু প্রতীম রাষ্ট্র ভারত থেকে বেনাপোল সীমান্ত যোগে আগত ফেনসিডিল নিয়মিত সেবন ইসমাইলের রক্ত চক্ষুর জন্য দায়ী। মতিউর রহমান নিজামী তার বিবৃতিতে এই তথ্য ব্যবহার করতে পারেন।

বাংলাদেশে ফেনসিডিল বাজির জন্য মোসাদ এবং 'র'কে দায়ী করা যেতেই পারে। ইসমাইল খানিকটা তোতলা। কথা বলতে গেলে উষ্ঠা খায়। বজ্রকণ্ঠ বঙ্গবন্ধুর ছাত্রলীগের নেতার তোতলামী সাজে না। তবে ইসমাইল কথা বলার সময় ৭ মার্চের মত আঙুল উঁচিয়ে কথা বলে।

সার ছাত্রদলের ছেলিরা

আ. আ. আমার পার্টির ছেলিদের

মা-মা-মারিছে। বই খাতা ছিঁড়ি ফেলিছে।

হো- হো হোস্টেলের রুম পুড়ায় দিছে।

ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ফাসু বয়সে বড় হওয়ায় স্যার না বলে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলে ডাকে। তাতে সাজিদের কোনো অসুবিধা নেই। স্যার শব্দটা ছাত্র ছাড়া অন্যকারো মুখে শুনতে গা ঘিন ঘিন করে। অবশ্য তাই বলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পছন্দের সম্বোধন হুজুর শুনলেও শিউরে ওঠে। মনে হয় বাংলা ছবিতে রাজা দারাশিকোকে কর দিতে না পারা প্রজা এসে বলছে

হুজুর এবার ফসল হয়নি।

গোস্তাকী মাফ করবেন।

যাই হোক ফাসু ভীষণ গম্ভীর। ছাত্রজীবনে ইউনিয়ন করায় কথা বলে ধীরে ধীরে প্যাঁচ মেরে।

-প্রিন্সিপ্যাল সাহেব একটা তদন্ত কমিটি করা প্রয়োজন। তদন্ত কমিটি বিষয়টার প্রতি সাজিদের অ্যালার্জি। কারণ বাংলাদেশে যেকোনো তদন্ত কমিটির কাজ হলো প্রথমে ইস্যুটিকে ফাইলে আটকে ফারমেনটেশন বা চোলাই করা। তারপর ঐ ফাইলের গন্ধে পয়সা

খেয়ে অপরাধীর পক্ষে ভারডিক্ট দেয়া। তবু ফাসু অনড় তদন্ত কমিটি করুন। পকেট থেকে কাগজ বের করে কমিটির নাম লিখতে উদ্যত হয়। একদা ছাত্র ইউনিয়নের সবার পকেটেই সাদা কাগজ থাকে এবং দেওয়াল পত্রিকা লেখা গোটা গোটা অক্ষরে তারা কমিটির নামের তালিকা অথবা এজেন্ডা লিখতে ভালোবাসে।

ইসমাইল ফুঁসে ওঠে।

কি- কি-কি সের ক-ক-ক মিটি

সার। ছাত্রলীগের ছেলিরা ছাত্র

ধর্মঘট ডাকিছে।

মনে মনে সাজিদ বলে ঐতো তোমাদের দোষ। যেকোনো সময়কেই তোমরা ঊনসত্তুর মনে কর। কিন্তু ছাত্র নেতাদের সামনে হিসেব করে কথা বলতে হয়।

না না ধর্মঘট করো না

আমি তোমার ছেলেদের

হোস্টেলে ওঠার ব্যবস্থা করছি।

ফাসু বাধা দেয়

-কিন্তু তদন্ত কমিটি।

- সেটা পরে দেখা যাবে।

ইসমাইল আবার তোতলায়

শিশি শিবিরের ছেলিরাও

ছাত্রদলের সাথে ছিল।

তোতলামি বশত ইসমাইল শিবির এমনভাবে বলে যে সাজিদের সামনে ফেনসিডিলের শিশি এবং শিশুদের হিসি এই দুটো বিষয় ভেসে ওঠে। কিন্তু চেহারা গম্ভীর রাখে। এমন সময় একটা ভাঙ্গা গাড়ির শব্দ এবং হর্ন শোন যায়।

শরিফ দৌড়ে আসে

ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাডাম আসতিছে

শরিফ ভুলবশত: তার আগে বলেনি হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার।

শশব্যস্ত হয়ে ফাসু এগিয়ে যায়। এর কারণ দুটো; মাঠ প্রশাসনের প্রতি ট্র্যাডিশনাল ভীতি এবং সুরাইয়া হাসিনের দণ্ডায়মান সৌন্দর্য অবলোকন। ফাসুর মধ্যে নান্দনিক মর্ষকামিতার ভাব প্রবল।

ফাসু আসুন আসুন বলে এমনভাবে ডাকছে যেমন ঈশ্বরদী মোটরস্ট্যান্ডে তৃপ্তি হোটেলের বয় বাবুর্চিরা ট্রেন থেকে নামা বাস ধরতে দৌড়ে যাওয়া ক্ষুধার্ত যাত্রীদের মুর্গা মোসাল্লাম খেতে ডাকে।

সুরাইয়া হাসিন অন্যত্র যেমন ম্যাজিস্ট্রেট সুলভ দম্ভ দেখায় সাজিদের সামনে তা অনুপস্থিত। আফটার অল রিয়ার বেস্ট ফ্রেন্ড।

ইসমাইল ঘটনাটা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলতে গেলে ফাসু বাধা দেয়। ফাসুর এটিকেট সৈয়দ বংশীয়। সে সম্ভ্রমের সাথে সুরাইয়া হাসিনের খেদমত করতে চায়।

সাজিদ ইসমাইলকে বলে (তোতলামি কম করে) একটু গুছিয়ে ঘটনাটা উনাকে বলো।

ইসমাইল ঘটনা বলার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন। প্রিন্সিপ্যালের বাংলো থেকে হোস্টেল হাঁটা পথ। তবু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবা গাড়িতে যাবেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মা ফ্রন্টে পরিত্যাক্ত একটি সবুজ গাড়ি। তার সামনের সীটে যেখানে ম্যাজিস্ট্রেট বসেন সেখানে একটি হলুদ তোয়ালে। পেছনে টেম্পুর মত দুটো সারি।

সুরাইয়া সাজিদকে সম্মান দেখাতে ওর সাথে সামনে বসতে বলে। সাজিদের কাছে এই প্রস্তাব খানিকটা বিপদজনক মনে হয়।

আমি মোবাইল ফেলে এসেছি।

তিন মিনিটের মধ্যে হোস্টেলে পৌছে যাব।

ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে নিয়ে যান।

সুরাইয়ার চেহারাটা খানিকটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলেও ফাসুর চশমার নিচে চোখগুলো ঘুরতে থাকে। গাড়ির সীটে নারীর সঙ্গে চাপাচাপি করে বসে হালকা করে গোড়ালি স্পর্শের আনন্দ ফাসুকে পুলকিত করে। পদার্থবিদ্যার লেকচারার বড়লোকের মেয়ে কবিরুন নাহারের গাড়িতে সিট খালি থাকা সত্ত্বেও একটু ঘন হয়ে বসে ফাসু রাষ্ট্রবিজ্ঞান বোঝায়। ডুর্ক-হাইমের নাম আর তত্ত্ব বলে কবিরুনের শরীরে শিহরণ জাগিয়ে তোলে। ফাসুর ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশনের গল্পে কবিরুনের ওভল্যুশন ত্বরান্বিত হয়। সুরাইয়ার সমভিব্যহারে যেতে একটাই ভয় পাছে কবিরুন দেখে ফেলে। তাতে আমও যাবে ছালাও যাবে। তবে সুরাইয়াকে বাগে পেয়ে ফাসু ছাত্র রাজনীতিতে গেম থিওরীর প্রায়োগিক বাস্তবতা সম্পর্কে একটা ফোরপ্লে উপস্থাপন করে।

হোস্টেল তথা অকুস্থলে ছাত্রদলের ক্যাডারদের টাইট ফেড জিন্স পরে পাছা উঁচিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। আজকাল তারা ক্ষমতাসীন বিধায় শিক্ষকদের সালাম দিতে অস্বীকৃতি জানায়। প্রবেশ পথে চেয়ারের ওপর পা তুলে চারটে মর্কট এমনভাবে বসে আছে যেন এই হোস্টেল ভবনটি তাদের অজ্ঞাত পিতৃকুলের জমিদারী। হোস্টেলের গেস্ট রুমে ছাত্রদলের সভাপতি বাচ্চুর বাহুলগ্না মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা পলি বেগম। পলিগ্যামীর ছাত্রী বহু ব্যবহারে জীর্ণ পৃথুলা উদ্ধত পলি বেগম সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য আবেদন করেছিল। অল্প বয়স এবং জামাতের স্ট্রং ক্যান্ডিডেট থাকায় আজ সে বাচ্চু মিয়ার বাহুলগ্না।

নইলে তাকে তরুণ কোনো সাংসদের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির হাওয়াখানায় পাওয়া যেত।

কোনো রকম সংকোচ ছাড়াই বাচ্চু মিয়া উঠে দাঁড়ায়। তারেক ভাইয়ের মত খুঁট করে চুল কাটা। কথা শুরুর আগে কালো সানগ্লাসটা নাকের ওপর বসিয়ে নেয়। যেন এক্ষুণি সে খাল কাটতে যাবে। সানগ্লাসের অভ্যন্তরে লাল জবার মত দুটো চোখ। ঐ যে ফেনসিডিল। শত্রুপ্রতিম ভারতের ঐ একটি জিনিসই তাদের প্রিয়। ইসমাইলের সঙ্গে বাচ্চুর ঐ একটি পররাষ্ট্র ইস্যুতে ঐক্যমত্য রয়েছে। ভারত গঙ্গা কিংবা তিস্তার জল ঠিকমত দিক বা না দিক এই ফেনসি জলতো ঠিকঠাক দিচ্ছে। অদূরে হাউজ টিউটরের কক্ষে জায়নামাজ পেতে রাতে হলদখলের কারণে কাজা নামাজ আদায় করছে শিবিরের সভাপতি আলবেরুনী। নাম শুনে মনে হয় আকিকার সময় এলাকার জামাতের রোকন শাবকটির নাম নির্ধারণ করেছিল দলীয় ঘরানায়। আলবেরুনী নামাজ সংক্ষিপ্ত করে গেস্টরুমে আসে। গোড়ালীর ওপরে পাজামা। ওজুর পানিতে পাঞ্জাবীর কলার ভেজা। থুতনির কাছে মরুদ্যানের মত কতিপয় ক্যাকটাস দাড়ি। গুম্ফহীন নূরানী চেহারা। অবশ্য আলবেরুনী এত ব্যস্ততার মধ্যেও অনুগ্রহ করে

আচ্ছালামালেকুম সার

বলে জাগতিক দায়িত্ব পালন করে। কারণ হুজুরকে সালাম না দিলে পরকালে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হইবেক।

-তুমি কী তোমার শিক্ষকদিগকে
সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলে।
-হ্যাঁ সারারাত্র জেহাদ করিয়াও
প্রত্যুষে এক কাফের ইহুদী নাছারা প্রতিম
প্রিন্সিপ্যালকে শিক্ষক বিধায়
সালাম দিয়াছিলাম। আস্তাগফেরুল্লাহ
-না তুমি ঠিকই করিয়াছিলে।
যে কারণে পশ্চাদভাগে পঞ্চাশ
বেত্রাঘাত থাকিয়া বাঁচিয়ে গেলে।
যাও বেহেশতের দিকে আগাইয়া যাও।
ফেরদাউসে জায়গা হইলো না।
উহা রোকনদের ভিড়ে হাউসফুল।
সাথীদের স্থান খুলছে।
তবে অপরিশেষ খেজুর আর
দুম্বার গোস্ত রয়েছে সেইখানে
ভক্ষণ করো।

জান্নাতুল খুলদের জানালা খুলে আলবেরুনী দেখবে হাবিয়ার জানালা খুলে টুল টুল করে তাকাচ্ছে ইসমাইল এবং বাচ্চু মিয়া। চক্ষু ফ্যাকাশে, ফেনসিডিল নাই। খাদ্যাভাবে রুগ্ন পলি জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আলবেরুনীর কাছে শুকনো খেজুর চাইছে।

আলবেরুনী প্রত্যাখ্যানের সাথে জানালা বন্ধ করে দেবে। কারণ তখন জোট গঠনের প্রয়োজন নাই। বাংলাদেশে আল্লাহর শাসন কায়েম হয়েছে ইতিমধ্যেই।

সাজিদ বাচ্চু মিয়া এবং আলবিরুনীকে বলে

দশটার সময় আমার রুমে এসো।

জরুরি কথা আছে।

ফাসু একটু কড়াভাবে বলে

তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাডাম উপস্থিত থাকবেন।

হোস্টেলের ভাঙচুর করা রুমগুলো দেখে বেরিয়ে আসে তিনজন। পোড়া বইয়ের ছাই, ছেঁড়া নোট দেখে সাজিদের একটা ফিল্মের কথা মনে পড়ে। নাৎসীরা যেভাবে বই পুড়িয়ে ফেলছিল। ছবিটার নামটা যেন কী।

ফাসুকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। ছবিতো দেখেনি। হিস্ট্রিতে চলে যাবে। আউশউইৎজের নাৎসী কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের গল্প ফাসুর কাছ থেকে তেতাল্লিশতমবার শোনার কোনো আগ্রহ নেই। অবশ্য সুরাইয়া হাসিন তাতে ফাসুর প্রতি ইমপ্রেসড হবার সম্ভাবনা বাড়তো। তাতে সাজিদের নিজের নিরাপত্তা বাড়তো। কিন্তু এখন ইতিহাস রোমন্থনের সময় নয়। চোখের সামনে একটা ইতিহাস বেড়ে উঠছে। অন্ধকারের গহীনের দিকে হেঁটে যাচ্ছে প্রতিটি দিন। প্রতিটি দিন নিমজ্জিত হচ্ছে রাতের অন্ধকার হামুখের মধ্যে। পাশাপাশি হাঁটছে যে দুজন, তারা কি তা ভাবতে পারছে। ওরা কী বুঝতে পারছে বাচ্চু মিয়া আর আলবিরুনীই আমাদের ভবিষ্যত নিয়ন্তা। একদিন সকাল বেলা নতুন সাংসদ পলিবেগম হিজাব পরে হাজির হতে পারে সুরাইয়া হাসিনের অফিসে।

তাকে বলতে পারে

একটু পর্দা পুসিদা সহকারে দপ্তরে আসবেন। আলবিরুনী একদিন হয়তো বামপন্থী ফাসুকে কানধরে বলবে

নামাজ জানেন মিয়া।

কোন তরিকার লোক।

আর সাজিদ। সাজিদের কী হবে। তাকে কী মাটিতে অর্ধেক পুঁতে পাথর নিক্ষেপ করা হবে। সাজিদের খুব ভেতরে একটা শক্তি আছে। এই শক্তি সে কোথা থেকে পায় সে জানে না।

সাজিদের চোখের সামনে সেই প্যাট্রিয়ট কবিতার দেশপ্রেমিকের চিত্রকল্প ভেসে ওঠে। একসময় যাকে ফুল দিয়ে অভিষিক্ত করা হয়েছিল তাকে আবার পাথর ছুঁড়ছে রাস্তার দুপাশের মানুষ।

আবার ছোটবেলায় নানার কাছে গল্প শুনেছিল নবীজী যখন তাওরাতে সত্য প্রচারে গিয়েছিলেন কুরাইশরা তার ওপর পাথর ছুঁড়েছিল। তার শরীর মুবারক রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। পাদুকায় জমেছিল চাপ চাপ রক্ত। গল্প শুনে সাজিদের মনে হয়েছিল সত্যের পথ অনেক কঠিন। নবীজীর ঐ গল্পটার একটা জেহাদী ব্যাখ্যা, খেলাফতী ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আলবেরুনীদের আছে। প্যাট্রিয়ট কবিতার বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই বাচ্চু মিয়ার নারকেলের খুলির মত মাথায় টগবগ করছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা নিয়ে ইসমাইল ইঁদুরের মত লুকিয়ে আছে কলেজ ক্যান্টিনে।

কিন্তু সাজিদ ভাবছে অন্যকথা। অন্য তরিকার কথা, যাতে আলবেরুনী, বাচ্চু কিংবা ইসমাইলের পোষাবে না। সেই তরিকার কথা সাজিদ এইসব অছাত্রদের বোঝাতে পারবে না। হয়তো কাজের ছেলে শরিফ মিয়াকে একদিন বলবে। কারণ ছেলেটা যখন কাঁচা হাতে অ আ ক খ লেখে তার মধ্যে বর্ণমালার প্রতি ভালোবাসার গন্ধ লুকিয়ে থাকে। যেদিন সে প্রথম নাম স্বাক্ষর শিখলো দৌড়ে এসে সাজিদকে কদমবুসি করেছিল। ওর চোখ দুটো ভিজেছিল। সাজিদের কাছ থেকে একুশে ফেব্রুয়ারির গল্প শুনে শরিফ বাগনের মধ্যে মাটি আর ইট দিয়ে একটা ছোট্ট শহীদ মিনার তৈরি করেছে। কোত্থেকে কালো রঙ এনে দিয়েছে তাতে। সুশীল সমাজ বছরে একবারই যায় শহীদ মিনারে ফুল দিতে। আলেম সমাজ অবশ্য এই বেদাতী কুফরি কাজে রাজী নয়। কিন্তু শরিফ তার ছোট্ট শহীদ মিনারে প্রতিদিন একটা করে ফুল দেয়। প্রতিদিন যখন সে একটা করে অক্ষর শেখে প্রতিটি দিন ওর জন্য একুশে ফেব্রুয়ারি হয়ে ওঠে। শরিফকে দেখে সাজিদ ছোট ছোট জিনিসকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে শিখেছে।

কলেজের শহীদ মিনারের বেদীতে ফাসুদের স্যুডো ইন্টেলেকচুয়াল আস্ফালন শোনার চেয়ে শরীফের বামুন শহীদ মিনারটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। সারাজীবন দৈত্যাকার দেশপ্রেম দেখে দেখে আজকাল সাজিদের শরিফের একটুকরো দেশের জন্য বামুন ভালোবাসা দেখতে ইচ্ছে করে। মনে হয় প্রিন্সিপাল বাংলোর ফুটফরমাশ খেটে, দুবেলা ভাত, বছরে তিনটে সবুজ চেক চেক লুঙ্গি, সাজিদের পুরনো অল্টার করা শার্ট, লাল আইসক্রীম খাওয়ার পঞ্চাশ পয়সা ব্যাস এইটুকু পাওয়া, কত খুশী এই শরীফ মিয়া। এইটুকু পাওয়ার পরেই সে বর্ণমালা শেখে, সে শহীদ মিনার বানায়। ওর জন্যে কোনো একুশে পদক কিংবা ম্যাগসেসে অপেক্ষা করছে না।

ফোনে শরীফের গল্প শুনে সজল বাইপোস্ট একটা বর্ণমালা আঁকা টিশার্ট পাঠিয়েছে। সেটা পরে শরীফ যে কী খুশী, কী খুশী। বারান্দার কোণার দিকে গিয়ে চোখ মুছে আর সজলের জন্য দোয়া করে।

একবার সাজিদের ইচ্ছা হয়েছিল বলে
দোয়া যদি করতেই হয়
বল, সজল এবং রাজিমার
বিয়েটা যেন ঠিক ঠাক হয়। ওদের
টেলিফোনে ঝগড়াটা কম হোক।
বিয়ের পর ঝগড়ার জন্য অখণ্ড
স্পেস এবং টাইম অপেক্ষা করছে।

সাজিদ মনে মনে হাসে। ছোট বেলায় সাজিদের বাড়ির পাশের এক ব্যর্থ প্রেমিক ইতিহাসের অধ্যাপক এমন মিটমিট করে হাসতো।

-এই হাসি সেই হাসি নয়তোরে সাজিদ। বাইজান আপনে পাগল হইয়ে যাইতেছেন না তো। প্রতি সাজিদ পাটুর মত টিপ্পনী কাটে। সুরাইয়া হাসিন অবাক হয়ে সাজিদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

- সাজিদ আর ইউ ওকে।

সেকি কলেজ বিল্ডিং এর মাঝখানটার ছোট্ট বাগান ঘেঁষে লাল সুড়কির পথটাকে ব্যাগী ট্রাউজার আর নীল টি শার্ট পরে অধ্যক্ষ সাজিদ। তার পাশে খানিকটা হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সুরাইয়া। একটা অফ হোয়াইট সালোয়ার কামিজ পরে। ধূসর চুন্দরি প্রিন্টের ক্রেপ ওড়না। কানে একটা অক্সিডাইজড দুল। কেবল এক কানে। অন্য কানটা খালি। জরুরি ফোন পেয়ে দৌড়েছে। পায়ে আড়ং এর চামড়ার চটি।

হঠাৎ ব্রাহ্ম মুহূর্তে সাজিদের মনে হয় সুরাইয়ার খুব নম্র সাজের রুচি আছে। তার ভাবনার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা সূক্ষ্মতা আছে। নইলে ফাগুন দিনে এমন সুন্দর করে সাজতে পারতো না মেয়েটা। মানুষকে দেখে পট করে একটা জাজমেন্ট দিয়ে দেয়া ভুল। রেল ক্লাবের সুরাইয়া হাসিনের চেয়ে কলেজের বাগান বিলাসের ঝাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে ওকে অন্যরকম লাগছে।

-দশটা বাজতে এখনো দেরী।

একটু বসবেন আমার ঘরে। নাকি ব্যস্ততা আছে।

-না না আই অ্যাম অন ডিউটি।

কিন্তু একটু ডিসি মহোদয়কে ফোন করতে হবে।

-নিশ্চয়ই করবেন। ডিসি মহোদয়কে ফোন করবেন তো বটেই।

-আপনাকে মহোদয় বলতে হবে না। আমি উনার অধীনে চাকরি করি তাই বললাম।